Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-4 Issue-1 July 2025

মুর্শিদাবাদের নগরনাট্যে লোকনাট্যের প্রভাব : একটি সমীক্ষা

সুবীর দেবনাথ ও শর্মিষ্ঠা আচার্য

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/15_Subir-Debnath-Sharmistha-Acharya.pdf

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনায় ইংরেজদের অবদান অনস্বীকার্য। সূচনালগ্নের বাংলা নাটকে লোকসাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব যে ছিল একথাও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য, মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চায় লোকনাট্যের প্রভাব নির্ণয় করা। মুর্শিদাবাদ জেলা লোকসংস্কৃতিক উপাদানের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি জেলা। আধুনিক নাট্যচর্চার ইতিহাসেও এই জেলার একটি গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে এই জেলার লোকসংস্কৃতি, লোকনাট্য, লোকভাষা ও অন্যান্য লোক উপাদানের প্রভাব এখানকার নগরনাট্য অর্থাৎ আধুনিক বাংলা নাটকে পড়েছে। এই আলোচনায় আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট কয়েকজন নাট্যকারের নির্বাচিত কয়েকটি নাটক বিশ্লেষণ করে আলোচ্য বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

সূচক শব্দ: সুধীন সেন, তর্জা গান, দিব্যেশ লাহিড়ী, গম্ভীরা, নানাহে, আলকাপ, প্রদীপ ভট্টাচার্য, দুলাল চক্রবর্তী, অন্ধকারের কথকতা।

ব্রিটিশ সরকার, সামন্ত জমিদার ও মহাজনী শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা। এই জেলার শতকরা প্রায় ৭০ভাগ মানুষ নিরক্ষর কৃষিজীবী। মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা এই অঞ্চলে লোকনাট্য, লোকসংস্কৃতি, লোকগান প্রভৃতি লালিত-পালিত হওয়ার জন্য আদর্শ। সেজন্যেই মুর্শিদাবাদ জেলাকে লোকসংস্কৃতির খনি বলা যেতে পারে। এই জেলা বাংলা লোকসংস্কৃতিতে বহু খ্যাত লোকশিল্পীকে উপহার দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পীরা হলেন, আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসু, কবিয়াল গুমানী দেওয়ান, কবিয়াল রিয়াজুদ্দিন, কবিয়াল নহীরুদ্দিন সেখ, কবিয়াল আব্দুল জোব্বার প্রমুখ। শুধুমাত্র লোকসংস্কৃতি নয়, নগরসংস্কৃতিতেও মুর্শিদাবাদের বিশেষ মর্যাদা আছে। নগরসংস্কৃতির প্রত্যেকটি শাখাতেই যেমন নাচ, গান, সাহিত্য, নাটক, আবৃত্তি প্রভৃতিতে মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিসন্তানরা খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং এখনো অর্জন করে চলেছেন।

এই জেলায় একসময়ে সারস্বত সমাজের আনাগোনা ভালোই ছিল। রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিত, 'বঙ্গদর্শনে'র আত্মপ্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সাহিত্য সম্মেলনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্ব এসব গৌরব মুর্শিদাবাদের সারস্বত সমাজের ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তীকালে রামদাস সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নিরুপমা দেবী, মনীশ ঘটক, ঋত্বিক ঘটক, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, মহাশ্বতা দেবী প্রমুখের আবির্ভাব মুর্শিদাবাদের মাটিকে গৌরবান্বিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আধুনিক বাংলা নাট্যচর্চার জগতেও মুর্শিদাবাদের একটি অনন্য স্থান রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা লোকসংস্কৃতির খনি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এখানকার লোকনাট্য নগরনাট্যকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে মুর্শিদাবাদের নগরনাট্য লোকনাট্যের প্রভাব আলোচনা করেছি।

বাংলা আধুনিক থিয়েটারের ইতিহাসে ব্রিটিশ সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা থিয়েটার যদি মানব শিশু হয়, তাহলে সেই শিশু শৈশবে লালিত-পালিত হয়েছে বাংলার সামন্তরাজা তথা জমিদার ও রাজপরিবারে অঙ্গনে। সেইদিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সামন্ত পরিবারগুলোও পিছিয়ে ছিল না। মুর্শিদাবাদ

জেলায় প্রথম রঙ্গামঞ্চের দেখা মেলে ১৮২০ সালে, বর্তমান বহরমপুরের ব্যারাকস্কোয়ার মাঠের কাছে, তৎকালীন ইংরেজ সেনানিবাসের ম্যাগাজিন বিল্ডিংয়ে। যদিও এবিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। তবে কান্দি রাজপরিবারের দ্বারা সামন্তপরিবার কেন্দ্রিক রঙ্গামঞ্চের স্বাদ প্রথম এই জেলা পেয়েছিল ১৮৫৯সালে। এই পরিবারের সন্তানরা ছিলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ; এঁরাই ছিলেন বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলা রঙ্গামঞ্চে এই দু'ভাইয়ের অবদান স্বীকার করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন —

"should the drama ever again flourish in india, posterity will not forget these nobel gentelmen the earliest friends of our rising national theatre" [১]

এছাড়াও মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজবাড়ি, নিমতিতা রাজবাড়ি, কান্দি জেমো রাজবাড়ি, লালবাগ ধরণীবাবুর রাজবাড়ি এগুলোতেও উন্নতমানের নাট্যচর্চার হতো। এইসকল সখের থিয়েটারের পরেই বিংশ শতকের প্রথমদিকে এই জেলায় দেখা মিলল পেশাদারী থিয়েটারের। আধুনিক বাংলা নাটকের ও রঙ্গামঞ্চের সূচনা পাশ্চাত্য আদর্শে হলেও, প্রেক্ষাগৃহে যখন এদেশীয়দের প্রবেশ ঘটল তখন থেকেই পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে দেশীয় লোকগান ও লোকনাট্যের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকল।

এই দেশে যখন আধুনিক নাটকের সূচনা হয়নি তখন সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত উভয় শ্রেণির মানুষদের বিনোদনের মাধ্যম ছিল লোকনাট্য ও লোকগান, যেমন যাত্রা, কবির লড়াই, আখড়াই, আফ আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতি। এই সকল লোকনাট্য ও লোকগানের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। তাই স্বভাবতই থিয়েটার যখন পেশাদারিত্ব লাভ করল তখন জনরুচির কথা মাথায় রেখে নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করার প্রবণতা লক্ষ করা গেল। তৎকালীন সময়ের নাটকগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যাত্রার অনুকরণে নাটকে গানের বাহুল্যতা, পদ্যছন্দে নাট্যসংলাপ রচনা করে শব্দঝংকার সৃষ্টি এবং সর্বোপরি নাটকের বিষয় নির্বাচনেও লোকউপাখ্যান ও দেবদেবী মাহাত্ম্যমূলক কাহিনির প্রাধান্য। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্যগবেষক ড. অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন — "জনগণের কাছাকাছি যাবার জন্য নাটক যেমন লোকাভিনয়ের ক্ষেত্র সন্ধান করেছে, তেমনি লোকনাট্য একটু বোধ হয় আভিজাত্যের লোভে এবং চটকদার মঞ্চআঙ্গিকের মোহে রঙ্গামঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।"[২]পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে গণনাট্যের পথনাটকগুলোতে এবং বাদল সরকার তৃতীয় ধারার নাটকেও লোকনাট্যের ফর্মকে ব্যবহার করে বাংলা নাটক ও রঙ্গামঞ্চের কিরীটে নতুন পালকের সংযোজন করেছেন। এই বৈশিষ্টগুলি বাংলা নাটকের তথা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাঞ্চলের জন্য সমান প্রযোজ্য। কেননা জেলাঞ্চলের নাটকচর্চা ছিল মূলত কলকাতা অনুসারী এবং কলকাতার তুলনায় জেলাগুলোতে লোকগান ও লোকনাট্য বৈচিত্রময় ও ভিন্ন। যেমন পুরুলিয়ার নিজস্ব লোকনাট্য ছৌনাচ, মাদলার গম্ভীরা তেমনি মুর্শিদাবাদের আলকাপ। তাই কোনো জেলার নাট্যচর্চার আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না, যদি সেই আলোচনায় লোকগান ও লোকনাট্যের সঙ্গে নগরনাট্যের সম্পর্ক নির্ণয় না করা হয়।

মুর্শিদাবাদের নগরনাট্যে লোকনাট্যের প্রভাবের মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এই দু'প্রকার নাট্যশৈলীর সাধারণ পার্থক্য বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। নগরনাটক বলতে আমরা মূলত নগরকেন্দ্রিক প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনীত নাটককে বুঝি। নাটক যেমন সাহিত্যের অঙ্গ তেমনি লোকনাট্যও লোকসাহিত্যের অঙ্গ। কিন্তু দীর্ঘদিন লোকনাট্যকে লোকসাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে পদবাচ্য করা হতো না কারণ, লোকনাট্য একটি performing art। লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন —

"লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী তার ভিতরে প্রবেশ করা সঙ্গত নয়, তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোন ধারা কিংবা ঐতিহ্যও থাকেনা।"[৩]

নাটক তথা নগরনাট্যের সংজ্ঞায় বলা যায়, পদ্য কিংবা গদ্য সংলাপের রীতিতে রচিত মঞ্চে অভিনয়-

যোগ্য, শ্রব ও দৃশ্যনির্ভর মাধ্যমের সাহায্যে পরিবেশিত বিনোদনমূলক মিশ্রশিল্প ও সাহিত্য। উপরিউক্ত সংজ্ঞার নিরিখে এবং দু'রকম সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে আঙ্গিকগত এবং বিষয়গত কিছু পার্থক্য আমরা পাই। যেমন নগরনাট্য সাধারণত প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনীত হয় কিন্তু, লোকনাট্য খোলা জায়গায় অভিনীত হয়; নগরনাট্যের কাহিনি ও সংলাপ পূর্ব লিখিত কিন্তু লোকনাট্যে কাহিনি মোটামুটি পূর্বপরিকল্পিত থাকলেও সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক ভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং কাহিনির বিষয়েও আঞ্চলিক সমস্যাকে তাৎক্ষণিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়; উভয় প্রকার শিল্পেরই মুখ্য উদ্দেশ্য বিনোদন কিন্তু লোকনাট্যের অন্যতম উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা; নগরনাট্যে প্রযুক্তির ব্যবহার আরোপে কৃত্রিম পরিস্থিতির তৈরি করে অভিনয়কে আরো বাস্তবসম্মত করার অবকাশ থাকে, কিন্তু লোকনাট্যে প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারের অবকাশ কম থাকে; নগরনাট্য সংলাপবহুল হয় আর লোকনাট্য গীতবহুল হয় এবং গীতের মাধ্যমেই অধিকাংশ কথোপকথন সংঘটিত হয়। এখানে বলে রাখা কর্তব্য যে, নাট্যশিল্প তার পথচলার পর থেকেই লোকনাট্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে, এই প্রভাব কখনো নাটকের বিষয়ে, কখনো সংলাপে, কখনো প্রয়োগিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে। বিশেষত, গণনাট্যের নাটকের ধারায় এবং বাদল সরকার প্রণীত তৃতীয় ধারার থিয়েটারে এই প্রভাব অধিক লক্ষ করা যায়।

সূচনালগ্নে মুর্শিদাবাদে নগরনাট্য সম্পূর্ণরূপে কলকাতা অনুসারী ছিল। ফলে মুর্শিদাবাদের নিজস্ব লোকনাট্যের প্রভাব তাৎকালীন নাট্যচর্চার মধ্যে পাওয়া যায় না। কলকাতার মঞ্চসফল নাটকগুলিই মুর্শিদাবাদের জমিদারবাড়িতে ও মঞ্চে অভিনীত হতো। পরবর্তীকালে বিংশ শতকের শেষার্ধে লোকসাহিত্যের আঙ্গিকে নাটক লেখার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ১৯৭৮ সালে, ভারতীয় গণনাট্যের মুর্শিদাবাদ শাখার প্রযোজনায় সুধীন সেন 'তর্জা' গানের আঙ্গিকে নির্বাচনী প্রচারের জন্য রচনা করেন 'দেবীমঙ্গাল কাব্য' নাটক। তিনিই নাটকটির সুর প্রদান করেন। তর্জা গান বহু প্রাচীন লোকগান। তর্জা অর্থে ছড়া কেটে কেটে গান গাওয়া বোঝাত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং উনিশ শতকে কবিগানের মধ্যে তর্জা গানের প্রেরণা লাভ করার ফলে এটিকে দু'দলের প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া গান বোঝায়। বর্তমানে অর্থাবনতির ফলে তর্জা বলতে তর্ক বা ঝগড়া বোঝায়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রচারের জন্য এই নাটকটিতে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুটো দল করে তর্জা গানের মাধ্যমে নাট্যকাহিনির অগ্রগতি ঘটেছে। নাটকটির পাণ্ডুলিপি কালের স্রোতে ভেসে গেলেও প্রথম অভিনয় অংশকারী শিল্পীর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা এই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। নাটকের প্রথম অভিনয়ে দক্ষিণপন্থী তর্জা গায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রবীর মুখার্জি (বিটু) এবং বামপন্থী গায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রীতেশ লাহিড়ী। তাৎকালে নাটকটির জনপ্রিয়তা জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর আমন্ত্রণে মুর্শিদাবাদের গণনাট্য শাখা নাটকটি বহুবার অভিনয় করেছে।

বহরমপুর 'প্রান্তিক' নাট্যগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠতম প্রযোজনা দিব্যেশ লাহিড়ীর 'নানাহে' নাটক। এই নাটকে লোকনাট্যের আঙ্গিককে পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মালদহের লোকনাট্য গম্ভীরার আঙ্গিকে রচিত এই একাঙ্ক নাটকটির রচনা ১৯৭৬ সালে। গম্ভীরা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন — 'মুখোস নৃত্য গম্ভীরা উত্তর বাংলার মালদহ জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।'[৪] মধ্যবঙ্গের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক পুলকেন্দু সিঙ্ঘের কথায় গম্ভীরা হলো — 'গম্ভীরা অর্থ শিবের মন্দির-আবার চৈত্র মাসের গাজন উৎসবকেও মালদহে গম্ভীরা বলে।'[৫] এই লোকনাট্যে শিবের উপাখ্যান প্রধান বিষয় হলেও, ক্রমে ক্রমে গম্ভীরা গানে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ, অভাব-অনটনের কথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'নানা' অর্থে শিব। গম্ভীরা পালায় শিব যিনি সাজেন তাঁকে সকলে নানা বলে সম্মোধন করেন এবং তাঁর কাছে নিজের সমস্যার কথা, অভিযোগের কথা জানান। 'নানহে' নাটকে গম্ভীরা শিল্পীদের চিরন্তন দুঃখ সংগ্রাম, দেশের জরুরি অবস্থায় তাঁদের ভূমিকা এবং সরকারের শাসন ক্ষমতার দণ্ড হিসেবে পুলিশের আগ্রাসনের চিত্র গম্ভীরাপালা অভিনয়ের দৃশ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের শুরু হচ্ছে গম্ভীরা পালাগানের মাধ্যমে —

"হে নানা
তুমি সুখ্যাতে র‍্যাখাছ নানা

তুমি কি যাঁড়ে চরহ্যা বেড়াও ঘূর্য্যা
দেখ্যাও তুমি দেখ না নানা।"[৬]

সত্তরের দশকে ভারতবর্ষে যখন জরুরি অবস্থা জারি হয় সেই সময় নাটকটি রচিত হয়েছিল। দিব্যেশবাবু তখন পেশাগত কারণে মালদাতে থাকতেন এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে জরুরি অবস্থার করুণ পরিণতি চিত্র দেখতেন। রাতে গম্ভীরার আসরে গিয়ে দেশের এই অবস্থার প্রতি গম্ভীরা শিল্পীদের প্রতিবাদ এবং তাঁদের প্রতি পুলিশের অত্যাচারের কাহিনি লক্ষ করতেন। তাঁর সেই পর্যবেক্ষণের ফসল এই নাটকটি। নাটকটি তৎকালে প্রসেনিয়াম এবং খোলা মঞ্চ উভয় জায়গাতেই প্রযোজিত হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রে নাট্যাভিনয়ে সাফল্য এসেছিল আশাতীত। এই নাটকটি নাট্যকার হিসেবে দিব্যেশ লাহিড়ীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এরপরে মুর্শিদাবাদের নিজস্ব লোকনাট্য 'আলকাপ'কে নিয়ে রচিত প্রদীপ ভট্টাচার্যের 'মায়া' নাটকটিকেও লোকনাট্যকে অনুসরণ করে নগরনাট্য রচনার নিদর্শন রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যদিও নাটকটি মৌলিক নাটক নয়, মুর্শিদাবাদের আর এক ভূমিপুত্র প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা সিরাজের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ'এর নাট্যরূপ। আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসুর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত এই নাটক। প্রসঙ্গত, সর্বপ্রথম আলকাপ সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন। 'আল' মানে 'হুল', এবং 'কাপ' মানে 'রসাত্মক নাটক'; প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য বলেছেন, 'আলকাপ'এর 'কাপ' অংশটি "রঙ্গারসের কৌতুকের দ্যোতক"। আলকাপের আঙ্গিক ছিল — বন্দনা, ছড়া ও কাপ কিন্তু আলকাপে নতুন সংযোজন ঘটে বৈঠকি বা খেমটা এবং পাল্ল। আলকাপের 'কাপ' অংশে ছেলেরা মেয়ে সেজে নৃত্যসহকারে গান করে, এই শিল্পীদের বলা হয় কপ্যা, ছোকরা বা সাঙাল। আলকাপের মূল আকর্ষণ এই 'কাপ' অংশটায়। আলকাপের শ্রেষ্ঠ শিল্পি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের ধনপতনগর গ্রামের ঝাঁকসু, তাকে নিয়ে আমাদের এই 'মায়া' নাটকটি। এই নাটকে ঝাঁকসুর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, প্রেম, বহুগামীতা, সমকামিত এবং আলকাপের পালার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আলকাপের জন্যই ঝাঁকসু পরিচিত, অর্থাৎ তাঁর জীবনের প্রধান আবর্ত এই আলকাপ। আর আলকাপের প্রধান খ্যাতি অনেকটা নির্ভর করে ছোকরা / ছুকরির ওপর। এই ছুকরিরা হয় দেহগতভাবে পুরুষ কিন্তু মনের দিক থেকে এবং চলন-বলনে মেয়ে, আলকাপের মায়া এই ছোকরা। এই ছোকরাদের প্রেমেই ঝাঁকসু বারবার পড়ে, তাঁর এই ব্যর্থ প্রেম এবং ছুকরিদের দ্বারা বারবার প্রতারিত হওয়ার কাহিনি নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকটি মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে আলকাপের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে 'আলকাপ পালা' গাওয়া হয়েছে। 'মায়া' নাটকটিতে 'নানহে' নাটকের মতো লোকনাট্যের আঙ্গিককে ব্যবহার করা হয়নি; তবে লোকশিল্পীর জীবনকে মঞ্চে অবতারণা করতে এবং আলকাপ শিল্পীদের জীবনযন্ত্রণার চিত্র পরিস্ফুট করতে মঞ্চের মধ্যে আলাকাপ আসরের বাস্তবানুগ আয়োজন করা হয়েছিল। নাটকটির তৃতীয় দৃশ্যে আলকাপ পাল্লায় একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ঝাঁকসু ও গোপাল ওস্তাদ, দৃশ্যটির মঞ্চনির্দেশে নাট্যকার লিখেছেন –

"বিনোদিঘি গ্রামে আলকাপের আসর। চন্দ্রমোহন জুয়াড়ির তাঁবু ও আলকাপে আসর পাশাপাশি চলে। আসবে ঝাঁকসু ওস্তাদের পাল্লাদার গোপাল ওস্তাদ। আসরে দেখা যায় একটি কাপের পাল্লা করছে — গোপাক ওস্তাদ একটি লাঠি নিয়ে লাঙল চষছে মাঠে। বুড়ো হয়েছে, একা লাঙল ঠেলতে পারছে না — তাই গেয়ে ওঠে।" এই মঞ্চ নির্দেশ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে নাট্যকার আলকাপের আংশিক আঙ্গিককে নগরনাট্যের আঙ্গিকে প্রসেনিয়াম মঞ্চে মঞ্চায়ন করাতে চেয়েছেন।

এছাড়াও মুর্শিদাবার জেলার অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব, নাট্যকার দুলাল চক্রবর্তীর 'অন্ধকারের কথকতা' নাটকটিও লোকনাট্যের আঙ্গিকে রচিত। নাটকটিতে বিড়ি শ্রমিকদের জীবনে আর্থিক অনটন, অবগুণ্ঠিত শিক্ষার দুরাবস্থার চিত্রকে বাস্তবসম্মতরূপে মঞ্চে পরিবেশন করতে গিয়ে নাট্যকার আলকাপের আসরকে নাট্যকাহিনির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাটকটি সর্বপ্রথম 'ফারাক্কা ব্যারেজ নাট্যাঙ্গন' দ্বারা বাঁকুড়াতে ১৯৯৯ সালে প্রযোজিত হয়েছিল। আসলে মুর্শিদাবাদের অন্যতম হস্তশিল্প হলো বিড়ি শিল্প। অধিকাংশ বিড়ি শ্রমিক গ্রামে বসবাস-

করেন। নাট্যকার গ্রামীণ বিড়ি শ্রমিকদের বাস্তব জীবনকে কাছ থেকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন। মুর্শিদাবাদের গ্রামবাসীর লোকশিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম হাতিয়ার ছিল আলকাপ। তাই নাট্যকার বাস্তাবানুসারে নাটকে আলকাপের প্রসঙ্গ টেনেছেন। আঞ্চলিক লোকভাষার ব্যবহার নাটকটিকে আরো লোক উপাদানে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। জঙ্গীপুর-ফারাক্কা সংলগ্ন গ্রামীণ মানুষের কথপোকথনের ভাষার অনুকরণে খোট্টা ভাষায় নাট্য-সংলাপ রচনা করেছেন। নাটকের শেষের দিকে মোশনমাস্টারের একটি সংলাপে নাটকটির মূল বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে —

"আন্ধারের কথকতার ই-কাহানি লতুন লয়। এই আন্ধারে
তামাম জঙ্গীপুরের বিড়ি শ্রমিক বাঁচার পথ খুঁজছ্যা"[৭]

সমাজকে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত করা লক্ষ্যে নাটক রচিত হয়। 'অন্ধকারের কথকতা' নাটকটি সেই লক্ষ সফল একটি নাটক।

লোকনাটক থেকে উপাদান জুড়ে মুর্শিদাবাদের নগরকেন্দ্রিক নাটক নিজের মুকুট সজ্জিত করেছে। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না, শুধু মুর্শিদাবাদ জেলা নয় সম্পূর্ণ বাংলা নাট্যসাহিত্য ও আধুনিক বাংলা থিয়েটার লোকসাহিত্যের কাছে ঋণী। কিন্তু বর্তমানে টেলিভিশন, মোবাইলের ব্যবহারের বাড়ন্তে জেলাঞ্চলের নাট্যচর্চা যত ব্যাহত হচ্ছে তার থেকেও অধিক ব্যাহত হচ্ছে লোকনাট্য চর্চা। ফলে বর্তমানে নগরনাট্যের মধ্যে লোকনাট্যের উপাদান খুব কম আহূত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১. 'মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, পৃ. ২১৮
২.'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', অজিতকুমার ঘোষ, সাহিত্যলোক, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০৫, কলকাতা, পৃ. ১
৩. 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', আশুতোষ ভট্টাচার্য, নয়া দিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, পৃ. ১২৯
৪. ওই, পৃ. ১১৭
৫. 'মধ্যবঙ্গের লোকসঙ্গীত', পুলকেন্দু সিংহ, বহরমপুর, শিল্পনগরী, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃ. ১২৭
৬. '৬০ বছরের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক', নাট্যচিন্তা, পৃ. ৩৩৪
৭. 'গ্রুপ থিয়েটার', আগস্ট-অক্টোবর ২০০৩, পৃ. ৪৪৪

লেখক পরিচিতি: সুবীর দেবনাথ, গবেষক, বিনোদ বিহারী মাহতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ এবং ড. শর্মিষ্ঠা আচার্য, সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সিন্দ্রী কলেজ, সিন্দ্রী, ঝাড়খণ্ড।